তীব্র আক্রমণের মুখে শ্রমিকশ্রেণী

কোভিড- ১৯ মহামারির বিরুদ্ধে মহারণ অতিদ্রুত ভারতের শ্রমজীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হয়ে চলেছে। চলতি বছরের মার্চ মাসে সরকার জানিয়েছিল সারা দেশে মোটামুটি ১০ কোটির মত রাজ্যান্তরী পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। তালাবন্দির সঙ্গে সঙ্গে এঁদের অতি বৃহদংশ রুটি - রুজি হারিয়েছেন। পরিবারসহ আশ্রয় ও খাদ্য হারিয়ে তাঁরা এখন সামনে শুধু হতাশার অন্ধকার দেখতে পাচ্ছেন। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রায় সবাই-ই শারীরিক পরিশ্রম করে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করেন। এঁদের কেউ কেউ নির্মাণ ক্ষেত্রে, কেউ বা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র বা মাঝারি মাপের কারখানায়, আবার কেউ কেউ বাজারে বা বিতরণ ক্ষেত্রে শ্রমিকের কাজ করেন।

নয়াউদারবাদী পুঁজিতন্ত্র খুব জেনেবুঝেই শ্রমিকশ্রেণীকে কোণঠাসা করে চলে। গ্রামীণ এলাকা বা ভিন রাজ্য থেকে যেসব শ্রমিক কাজের খোঁজে শহরে অথবা শিল্পাঞ্চলে চলে গেছেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে কারখানায় বা বাণিজ্যিক উদ্যোগে কাজ করে চলেছেন, তাঁরা এখানো 'পরিযায়ী শ্রমিক' নামেই পরিচিত। কারণ তাঁদের স্থায়ী কোনো কর্মনিযুক্তি নেই, স্থায়ী রোজগার বা সামাজিক সুরক্ষা বা আবাসন (যাকে ' নিজের ঘর' বলা চলে), কিছুই নেই।

স্বাধীনতা- উত্তর সময়ে যখন শিল্পায়ন চলছিল, তখন শ্রমজীবী মানুষের প্রথম প্রজন্ম তাঁদের কর্মস্থলের পাশেই স্থায়ী আবাস করে নিতেন। ফলে স্থানীয় সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতেন। কিন্তু এখন আর এমনটা ঘটে না। এখনকার শ্রমশ্রক্তির প্রায় সবাই (৯০ শতাংশ বা তারও বেশি) দৈনিক হাজিরার অথবা ঠিকা বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। এঁদের কাউকেই কর্মস্থলের পাশাপাশি শিকড় মেলতে দেওয়া হয় না।

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস যাকে ' পুঁজিবাদী শোষণের কৈশোর দশা' বলে বর্ণনা করেছিলেন, এই শ্রমিকদের অবস্থা অনেকটা সেরকম। শোষণের আদিমতম রূপের শিকার এই শ্রমিকশ্রেণী ও তাঁদের পরিবার পরিজন। ১৮৪৫ সালে লেখা 'ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণীর দুরবস্থা' (দ্য কণ্ডিশন্স অব দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড) গ্রন্থে এঙ্গেলস এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

ঐ সময়ের সঙ্গে এখনকার সময়ের একটাই তফাৎ শোষণপ্রক্রিয়া সেই আদিমতম রূপেই চলছে, তার সঙ্গে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক সরবরাহ- শৃঙ্খল যুক্ত করে শোষণপদ্ধতিকে আরও তেজি করে তোলা হয়েছে

আর্থ- সামাজিক ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস যে ভয়াবহ আঘাত হেনেছে তার অভিঘাতটা বহন করতে হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষকে। পরিযায়ী শ্রমিক সংকটের মধ্য দিয়ে দেশের শ্রমজীবী শ্রেণীর দুর্বিষহ অবস্থারই প্রকাশ ঘটেছে। এই অবস্থা নতুন করে সৃষ্টি হয় নি, শ্রমজীবী মানুষ এই অবস্থাতেই ছিলেন, তবে মূলধারার সংবাদমাধ্যমে ও জনবিতর্কের পরিসরে এটা এমনভাবে আগে কখনো আসেনি, বরং বিষয়টিকে লুকিয়েই রাখা হত।

ঐ সঙ্গে এই বিশাল ' গায়ে গতরে খাটা' জনসমুদায়ের প্রতি মোদি সরকার কী ধরনের অবহেলার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তারও নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে এই সংকটকালে। প্রথমেই বিনা নোটিশে দেশ জুড়ে তালাবন্দি ঘোষণা করে এই শ্রেণীর মানুষের জীবন - জীবিকার ওপর মোক্ষম আঘাত হানা হল, তারপর যখন সারা দেশের লক্ষ লক্ষ অসহায় দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ আর্তনাদ করে ঘরে ফেরার কথা বলতে লাগলেন, তখন সরকার চোখ - কান বন্ধ করে মুখ ঘুরিয়ে রইল। যখন কর্পদকশূন্য, খাদ্যহীন ও আশ্রয়হীন ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতবারে সড়কে নেমে এসে হাঁটাপথে ঘরমুখো রওনা হলেন, তখন তাদের উপর নেমে এল নির্মম অত্যাচার, পুলিশি লাঠির আঘাত আর রাজ্য সীমানা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার মত নির্দয় ব্যবহার , ঐ সঙ্গে তাঁদেরকে ধরে ধরে গাদাগাদি করে পুরে দেওয়া হল অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে।

প্রায় ৪০ দিন এমন অসহনীয় অবস্থা চলার পর, মূলত রাজ্য সরকারগুলি নিরন্তর দাবির ফলে ফরমান জারি হল, আটকা পড়া শ্রমিকদের বাসে করে নিজ রাজ্যে ফেরানো যাবে।বাস্তববোধবর্জিত ও ব্যয়বহুল এই ফরমানের বিরুদ্ধে আবার রাজ্যগুলি সরব হল। শেষ পর্যন্ত ১ লা মে তারিখে ঘোষণা হল, এই শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে। কিন্তু এখানেও চূড়ান্ত অমানবিকতার নজির দেখিয়ে সরকার বলে দিল, যাত্রীদের পুরো রেলভাড়া দিতে হবে।

অসহায় শ্রমিকদের সঙ্গে সরকারের এহেন অমানবিক রসিকতার বিরুদ্ধে যখন বিরোধী দল ও সংবাদমাধ্যমের একাংশ সোচ্চার হল, তখন সরকারকে চরম বিভ্রান্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। প্রথমে সরকারি মুখপাত্র বলতে লাগলেন, শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে সর্বমোট যা খরচা হবে, তার ৮৫ শতাংশই তো কেন্দ্রীয় সরকার বহন করছে, বাকি ১৫ শতাংশ বহন করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য। কিন্তু এই মিথ্যাভাষণ হালে পানি পেল না। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার বলতে শুরু করল, রাজ্যগুলিই তো রেলগাড়ির দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, ভারতীয় রেল যে লিখিত নির্দেশ জারি করে, তাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, স্লিপার ক্লাসের মোট ভাড়ার সঙ্গে আরও ৫০ টাকা অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে।

কিন্তু এর পরেও বহু শ্রমিক ট্রেনে উঠতে পারেননি। যেমন , মুম্বাইতে শ্রমিকেরা অভিযোগ করলেন, তাঁরা যে রেল ভ্রমণ করতে শারীরিকভাবে সক্ষম, তার প্রমাণস্বরূপ মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পেশ করতে হবে। বেসরকারি ডাক্তার বা হাসপাতাল থেকে ঐ সার্টিফিকেট জোগাড় করতে আরো ১০০০- ১৫০০ টাকা খরচা করতে হচ্ছে, যেটা তাঁদের জন্য অসম্ভব। সুতরাং আবার আমরা দেখতে পেলাম, বহু পরিযায়ী শ্রমিক পায়ে হেঁটে ঘরমুখো যাত্রা শুরু করলেন, ঠিক যেমনটা দেখা গিয়েছিল ২৫ মার্চ তালা বন্দি ঘোষণা হবার পর।

অন্যদিকে মোদি সরকার সম্ভবত পরিযায়ী শ্রমিকদের রেলপথে ঘরে ফেরানোর বিষয়টি নিয়ে নতুন ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। গত ৩ মে তারিখে দেশের স্বরাষ্ট্র সচিব সকল রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে লেখা চিঠিতে বিশেষ ট্রেনে সফরকারী পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা যথাসম্ভব সীমিত রাখার জন্য বলেছেন। এই বিভ্রান্তিকর নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিশেষ ট্রেন সেইসব ব্যক্তিদের ঘরে ফেরানোর জন্যই চালানো হচ্ছে, যাঁরা 'তালাবন্দির ঠিক আগে' নিজের বাসস্থান ছেড়ে কর্মস্থলে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরতে পারেননি। এই নির্দেশিকার ফলে পরিযায়ী শ্রমিকের যাঁরা বাড়ি ফিরতে চাইছেন, তাঁদের বেশির ভাগই বাদ পড়ে যাবেন।

মনে হচ্ছে, তালাবন্দি উঠে গেলে কাজের জায়গায় শ্রমিকের অপ্রতুলতা দেখা দেবে, এটা ভেবেই মোদি সরকার বেশি কাতর হয়ে পড়েছে। এই মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদিউরাপ্পার সেই আহ্বানে, যাতে তিনি নির্মাণসংস্থাগুলির কথা ভেবে শ্রমিকদের ঘরে ফিরে না যেতে অনুরোধ করেছেন। ঐ আহ্বানের পরেই কর্ণাটক সরকার ঐ রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে বিহারে যাবার বিশেষ ট্রেন বাতিল করে দিয়েছে। সস্তায় পাওয়া শ্রমিকদের 'বাঁধা শ্রমিক' বানানোর এ এক জবরদস্তি প্রচেষ্টা।

দেশের অতিশীঘ্র পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মপরিমণ্ডল সংক্রান্ত বিধি, ২০১৯ বলবৎ হতে চলেছে। এই বিধি বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক (কর্মনিযুক্তি ও তৎসংক্রান্ত শর্তাবলি) আইন, ১৯৭৯ প্রত্যাহার করা হবে। অথচ এই আইনটুকুই যৎসামান্য হলেও পরিযায়ী শ্রমিকের অধিকার ও ন্যায্য পাওনা সম্পর্কে কথা বলে। তবে এটাও বাস্তব যে এই আইন আজ পর্যন্ত তেমনভাবে রূপায়ণ করাই হয়নি। তাই ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (সি আই টি ইউ) দাবি করেছে, এই মুহূর্তে যখন পরিযায়ী শ্রমিকেরা অভূতপূর্ব অস্তিত্বের সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন, তখন এই আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া তাঁদের প্রতি অপরাধ সদৃশ হবে। বরং যেটা করা দরকার, তা হল এই আইনটিকে আরো শক্তপোক্ত করে যথাযথভাবে রূপায়ণ করা।

পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে যা করা হচ্ছে, তা থেকে শ্রমিকদের সার্বিক অধিকারের উপর কীভাবে আঘাত হানা হবে, তার এক পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই চারটি রাজ্যে শ্রমিকদের অধিকারসম্পর্কিত আইন ও বিধি পরিবর্তন করে কারখানা শ্রমিকদের কাজের সময় ৮ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ১২ ঘণ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে সবার আগে আদেশ জারি হয়েছে রাজস্থানে, তারপর একে একে গুজরাট, পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশে। গত ২৭ এপ্রিলের ভিডিওকনফারেন্স চলাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানের অশোক গেহলোত সরকারের প্রশংসা করেছেন। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় অন্য কোনো রাজ্যের প্রচেষ্টার জন্য তাঁর মুখে কোনো প্রশংসাবাক্য শোনা যায়নি।

রাজস্থান সরকারের জন্য নরেন্দ্র মোদি যে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন, তা থেকে অন্যান্য রাজ্য যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। এর পরেই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহান ঘোষণা করেছেন, তাঁর রাজ্যেও শ্রম আইন পরিবর্তন করা হবে। তিনি আরো বলেন, শ্রম আইন পরিবর্তন করে কারখানা পরিদর্শন শিথিল করা হবে, বিভিন্ন রেজিস্টার যেগুলি বাধ্যতামূলক লিখতে হয়, তাতে ছাড় দেওয়া হবে, এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের সুবিধা অনুযায়ী শিফটের সময় পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হবে। এছাড়াও তিনি বলেন, নতুন কারখানাগুলিকে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে শ্রমিক পিছু বার্ষিক ৮০ টাকা করে দেবার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করা হবে।

এছাড়াও কারখানাগুলিকে আরো অনেক ছাড় দেওয়া হবে বলে তিনি জানান, যেগুলি মূলত শ্রমিক স্বার্থবিরোধী বলেই প্রতিভাত হয়েছে।

পুঁজিবাদের স্বাভাবিক নিয়মে সকল সংকট নিরসনের প্রয়াসে মূলত শ্রমিকশ্রেণীর উপরেই আঘাত নেমে আসে। ইতিমধ্যেই বিশাল সংখ্যায় শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি-র (সি এম আই ই) প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ১৫ মার্চ তারিখে বেকারত্বের হার ছিল ৬.৭৪ শতাংশ, কিন্তু এর পর বাড়তে থাকা বেকারত্ব গত ৩ মে তারিখে এসে দাঁড়িয়েছে ২৭.১১ শতাংশে। যে শ্রমিকদের এখনো কাজে বহাল রাখা হয়েছে, তাঁদের বাধ্য করা হবে অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্য, কিন্তু এর জন্য যথোপযুক্ত বাড়তি মজুরি দেওয়া হবে না, সুরক্ষা ও অধিকার তো বহু দূরের কথা।

মোদি সরকার এবং শাসক পক্ষ আগামী দিনগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর উপর এইভাবেই বলপ্রয়োগ করতে চাইবে। যেভাবেই হোক এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে আমাদের প্রতিহত করতে হবে। এর জন্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

(সৌজন্যঃ পিপলস ডেমোক্র্যাসি- সম্পাদকীয়: ৩-১০ মে, ২০২০)